রাজপুত্র

(গল্পগ্রন্থ – তালনবমী)

কাঞ্চীর রাজপুত্র এবার যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন। রাজ্যময় ধুমধাম পড়ে গেছে। কাঞ্চীর উত্তর প্রান্তে গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুমন্দির। পুরোহিত গেছেন সেখানকার আশীর্বাদী নির্মাল্য আনতে, লোক পাঠানো হয়েচে প্রয়াগতীর্থ থেকে জল আনবার জন্যে। সেই জলে স্নান করিয়ে বিষ্ণুরপূজা-নির্মাল্য তার কপালে ঠেকিয়ে রাজপুত্রকে পুরনারীরা বরণ করবেন।

রাজা বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করেচেন। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। কোশলরাজের দূত কি এক প্রস্তাবনিয়ে এসেছে, রাজা তাই আজ সারাদিন ধরে মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করছিলেন— শরীর ও মনদুই-ই বড় ক্লান্ত। এমন সময়ে রাজকুমার কক্ষে ঢুকে পিতাকে প্রণাম করে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাজা বললেন, "চন্দ্রসেন, তোমার কিছু বলবার আছে?"

রাজপুত্র বিনীত অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, "বাবা, গত বছর যখন গুরুগৃহ থেকে ফিরেআসি তখন আপনি বলেছিলেন আমায় কিছুদিন দেশভ্রমণে যাবার অনুমতি দেবেন। আপনার অসুখের জন্যে এতদিন কোনো কথা বলিনি—আমি এইবার সে বিষয়ে অনুমতি চাই।"

মহারাজ বিস্মিতসুরে বললেন, "কি বিষয়ে অনুমতি চাই বলো?"

"আমি দেশভ্রমণে যেতে চাই বাবা।"

"তুমি জানো তোমার যৌবরাজ্যের অভিষেকের সব আয়োজন করা হয়েচে?"

"সেই জন্যেই তো আরো বেশি করে যেতে চাই, বাবা। আমি কাঞ্চী ছাড়া জীবনে কখনো কিছু দেখলুম না, কিছু জানলুম না,—কানে শুনেচি উত্তরে হিমবান পর্বত আছে, দক্ষিণে সমুদ্র আছে, পশ্চিমে সিন্ধুনদ আছে— কাঞ্চী ছাড়া আরো কত রাজ্যদেশ আছে, কিন্তু উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সে আমি চোখ থেকেও অন্ধ। যার জীবনে কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তাকে দিয়েদেশ-শাসন কি করে হবে? আমায় যেতে দিন বাবা।"

এর দু'দিন পরে রাজ্যের লোক সবিস্ময়ে শুনলে রাজকুমার চন্দ্রসেনের অভিষেক-উৎসবসম্প্রতি স্থগিত থাকল—কারণ তিনি চলেচেন বিদেশভ্রমণে—একা, সঙ্গে তিনি কাউকে নিতেরাজী নন।

সত্যই রাজকুমার কাউকে সঙ্গে নেননি।

আজ সপ্তাহ উত্তীর্ণ হয়ে গেচে, চন্দ্রসেন তাঁর প্রিয় সাদা ঘোড়াটিতে চড়ে একা পথচলেচেন। আর সঙ্গে থাকবার মধ্যে বাঁদিকে খাপে-ঝোলানো পিতৃদত্ত তলোয়ারখানি। আর আছে চোখে অসীম তৃষ্ণা, বুকে অদম্য সাহস ও নির্ভীকতা। কাঞ্চী রাজ্যের সীমা ছাড়িয়েওদু'দিনের পথ চলে এসেচেন। কত গ্রাম, মাঠ, বন নদী পার হয়ে চলেচেন—সবই অচেনা, এতাঁর নিজের রাজ্য কাঞ্চী নয়, এখানে তিনি একজন অজানা পথিক মাত্র।

তখনো সূর্য অস্ত যায়নি। এক নদীর ধারে তার ঘোড়া এসে পৌঁছুল তাকে নিয়ে। প্রকাণ্ড নদী—বৈকালের রাঙা আলোয় ওপারের বনরেখা অপূর্ব দেখাচ্ছে। অতবড় নদী কি করে পারহবেন, রাজকুমার চিন্তায় পড়লেন। কোনোদিকে মানুষের বাসের চিহ্ন নেই—সন্ধ্যার ছায়া ক্রমেধূসর হয়ে এল। বিজন নদী-তীরের ছন্নছাড়া চেহারাটাসুমুখ—আঁধার-রাতে গাঢ় ছায়ায় যেনআরো বেশি ছন্নছাড়া হয়ে ফুটে উঠল।

ওপারে বহু দূরে একটা পাহাড়-নীল চূড়া একটু একটু চোখে পড়ে। রাজকুমার চেয়েথাকতে থাকতে, পাহাড়ের ওপর থেকে আগুনের রাঙা একটা হল্‌কা হঠাৎ আকাশের পানে লক্‌লক্ করে জ্বলে উঠেই দপ করে নিবে গেল—রাজপুত্র অবাক হয়ে সেদিকে চেয়েই আছেন, এমন সময়ে একটা প্রকাণ্ড বাজপক্ষী সন্ধ্যার আকাশে ডানা মেলে নদীর উজান দিক থেকে উড়ে এসে তার মাথার ওপর তিন-চারবার চক্রাকারে ঘুরে আবার কোনদিকে অদৃশ্য হল।

রাজকুমারের নির্ভীক মনও একটুখানি কেঁপে উঠল। তিনি জানতেন তাদের বংশে কারুরমৃত্যুর পূর্বে তার মাথার ওপর গৃধ্রজাতীয় পাখি তিনবার ওড়ে—কেউ কেউ বলেছেন, বিশেষকরে শাকুন-শাস্ত্রবিৎ কোন গণকার সেবার বলেছিলেন যে এই গৃধ্র তাদের পূর্বপুরুষদের হাতেঅন্যায়ভাবে অবিচারে নিহত কোনো শত্রুর আত্মা—

বহুকাল ধরে সে পৈশাচিক উল্লাসের সঙ্গেজানিয়ে দিয়ে যায় নিজ শত্রুর বংশধরের মৃত্যুর পূর্বাভাস। কোথা থেকে আসে, কোথায় আবারউড়ে চলে যায়—কেউ বলতে পারে না!

রাতের সঙ্গে সঙ্গে এল হাড়কাঁপুনি ধারালো শীত। একটা বড় গাছও কোথাও নেই যারতলায় আশ্রয় নিতে পারেন। অবশেষে একটা মাটির ঢিপির পেছনে ঘোড়া থেকে নেমে রাজপুত্রনিজের আসন বিছালেন—সেখানটাতে হাওয়া বেশি লাগে না—শুকনো লতাকাঠি কুড়িয়েআগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করে সেরাত্রের মতো তিনি সেখানেই রইলেন। উপায় কি?

গভীর রাত্রে রাজপুত্রের ঘুম ভেঙে গেল। বহুদূরে যেন কাদের আর্তনাদ—মৃত্যু-পথেরপথিকদের অন্তিম চিৎকারের মতো করুণ। রাজপুত্র নিজের অলক্ষিতে একবার শিউরে উঠলেন।শয্যার পাশের আগুন নিবে গিয়েচে, উঠে আগুন ভাল করে জ্বাললেন—সারারাত্রির মধ্যে ঘুম আর এল না কিন্তু।

ভোরের দিকে একটা ডিঙি পাওয়া গেল, তাতে পার হয়ে রাজকুমার ওপারে গিয়ে উঠলেন। ডিঙির মাঝি আধ-পাগল এবং বোধ হয় কানে আদৌ শুনতে পায় না। রাজকুমারের প্রশ্নের কোনো উত্তর সে দিতে পারলে না।

প্রথমে একটা মরুভূমির মতো মাঠ-ঘাস, খড়, গাছপালা কিছুই নেই—কটা রঙের বালির পাহাড় এখানে-ওখানে। অনেক দূরে গিয়ে একটা জনপদ। কিন্তু কেমন একটা নিরানন্দ ভাব চারিদিকে। পথ দিয়ে পথিক চলে না, দোকান-পসারে খদ্দের নেই, নদীর ঘাটে স্নানার্থীর দল নেই, মাঠে চাষারা চাষ করে না—যেন কেমন একটা বিষাদ ও অমঙ্গলের ছায়া চারিদিকে।

রাজকুমার ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় বড় কাতর হয়েছিলেন। নিকটেই একটি গৃহস্থের বাড়ি। সেখানে গিয়ে আশ্রয় চাইতেই তারা খুব যত্নের সঙ্গে আশ্রয় দিলে। অনেকদিন পরে রাজকুমারভাল খাবার খেলেন, ভাল বিছানায় বিশ্রাম করতে পেলেন, মানুষের সঙ্গ অনেক দিন পরে বড়প্রিয় মনে হল। কয়েকদিন সেখানে রয়ে গেলেন তিনি। গৃহস্থের একটি ছোট মেয়ে ও ছোট ছেলের সঙ্গে রাজকুমারের বড় ভাব হল। তারা তাকে ফুল তুলে মালা গেঁথে দেয়, দুপুরে তার কাছে বসে গল্প শোনে, তাদের শত আবদার প্রতিদিন তাঁকে সহ্য করতে হয়। ছোট ছেলেটিরউপদ্রবের তো আর অন্ত নেই!

অল্পদিনের মধ্যে রাজকুমার সে বাড়ির সবারই তো বটেই, গ্রামের সকল লোকেরপ্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠলেন। এত সুন্দর মুখশ্রী, এমন সুন্দর কান্তি, এমন মিষ্টি স্বভাবের মানুষ তারা কখনো দেখেনি। রাজকুমারের আসল পরিচয় কেউ জানেনি, তিনি কাউকে সে সব কথা বলেননি—সবাই ভাবে তিনি একজন গৃহহীন পথিক—হয়তো তার কেউ কোথাও নেই। এতে সবারই স্নেহ তার ওপর আরো বেড়ে যায়, কিসে তিনি সুখে থাকবেন, কিসে আত্মীয়হীননিঃসঙ্গ প্রবাস-কষ্ট তার কমবে—সবারই এ চেষ্টা।

তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, এমন সুন্দর চেহারার ছেলে নিশ্চয়ই কোনো বড়ঘরের হবে। গ্রামের যিনি মণ্ডল, তার এক মেয়ে পরমাসুন্দরী—সবই বলে ওই ছেলেই এমেয়ের উপযুক্ত হবে। বিধাতা ওর জন্যেই যেন এ দেবতার মতো সৌম্যকান্তি ছেলেটিকেকোথা থেকে জুটিয়ে এনেচেন। মণ্ডলগৃহিণীও রাজকুমারকে একদিন দূর থেকে দেখে এত পছন্দ করলেন যে তিনি স্বামীকে জানিয়ে দিলেন, যদি ওই ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হয়ভালোই—নইলে মেয়ে চিরকুমারী থাকুক, তার আপত্তি নেই।

রাজকুমার কিন্তু কিছুতেই তেমন আমোদ পান না। তার মনে কি একটা বিপদের ছায়াসকল আনন্দকে ম্লান করে রাখে। একবার ভাবেন, হয়তো বাপ-মাকে অনেকদিন দেখেননি বলে এমন হয়—কিন্তু তার মন বলে তা নয়, তা নয়,—ওসব সামান্য সুখ-দুঃখের ব্যাপার এনয়—এ এমন একটা কিছু, যার কারণ আরো গভীর, জীবন-মরণ নিয়ে এর কারবার।

ক্রমে এল সে মাসের কৃষ্ণপক্ষ। রাজকুমার অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, বাড়িতে সবারইচোখে জল—গ্রামসুদ্ধ লোক সকলে বিষণ্ণ, নিরানন্দ। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলে না, কারণজিজ্ঞাসা করলেও উত্তর পাওয়া যায় না, সবাই কিসের ভয়ে জুজুহয়ে আছে যেন।

অবশেষে রাজকুমার কথাটা শুনলেন। এখান থেকে এক যোজন দূরে গৃধ্রকূট পাহাড়ের ওপর রাজগুরু এক কাপালিকের সাধন-পীঠ। প্রতি অমাবস্যায় সেখানে নরবলির জন্য প্রতি গ্রামথেকে পালাক্রমে একটি তরুণবয়স্ক লোক পাঠানো চাই-ই। রাজার হুকুম—এবার এ গ্রামের পালা।

শোনামাত্র রাজকুমার কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। তার পিতৃদত্ত তূণের তীক্ষ্ণ ইস্পাতেরফল-পরানো যে বাণ, তা কি শুধু নিরীহ পশুপক্ষী শিকারের জন্যে?

"ক্ষতি হতে ত্রাণ করে এই সে কারণ—মহান ক্ষত্রিয়নাম বিদিত জগতে।" —অস্ত্রগুরুরসে উপদেশ রাজকুমার কি ভুলে গিয়েচেন এত শীগ্‌গির!

অমাবস্যার দিন মণ্ডলের বাড়িতে পাশার সাহায্যে নির্ধারিত হবে এবার কে গ্রাম থেকেযাবে। রাজকুমার এ কথা শুনলেন। অমাবস্যার পূর্বদিন গভীর রাত্রের অন্ধকারে তিনি চুপি চুপিশয্যাত্যাগ করে কোথায় চলে গেলেন—কেউ জানে না। সকালে উঠে তাকে আর কেউ দেখতেপেলে না।

মণ্ডলের বাড়িতে পাশার মজলিসে যার নাম উঠল সে গৃহস্থের একমাত্র পুত্র। সবাইচোখের জলে ভেসে তাকে বিদায় দিলে। তার বৃদ্ধ পিতা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে চললকাপালিকের কাছে—যদি হাতেপায়ে ধরে ছেলেকে ছাড়িয়ে আনতে পারে এই দুরাশায়।

গৃধ্রকূট পর্বতের পাদদেশে গিয়ে তারা যা দেখলে, তাতে তারা অপ্রত্যাশিত বিস্ময়েহতভম্ব হয়ে গেল। বড় জামগাছটার তলায় দুটো মৃতদেহ : একটা তাদের গ্রামের সেই তরুণঅতিথির, আর একটা কাপালিকের—দেখে মনে হয় দুজনেই পরস্পরকে অস্ত্রাঘাত করেছে। দলে দলে স্ত্রীপুরুষ সবাই ছুটে এল দেখতে, যে নিজের প্রাণ দিয়ে তাদের চিরকালের জন্যেবিপদমুক্ত করে গেল-রাজার ভয়ে গোপনে চোখের জলে ভেসে তার শেষ সৎকার সম্পন্নকরলে।

রাজকুমারের সত্যিকার পরিচয় সে দেশের লোক তখনো জানেনি।